*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p35-44. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

অগ্নিযুগের বীরঙ্গানা বিপ্লবী বীণা দাস

প্রসেনজিৎ সিকদার
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email: prasenjitsikdar2609@gmail.com

সারসংক্ষেপঃ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশ মাতাকে শৃঙ্খল মুক্ত করতে ভারতমাতার অনেক বীর সন্তানেরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে বিপ্লবীদের প্রাণকেন্দ্র বাংলা অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছিল। এইসময় ভারতমাতার বীর সন্তানেরা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করেননি। বাংলার অনেক নারী এই অগ্নিযুগে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন। এই সকল নারী বিপ্লবীদের মধ্যে বিশিষ্ট নারী বিপ্লবী ছিলেন বীণা দাস। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। কবি ও দার্শনিক মনের অধিকারী বীণা দাস সময়ের উত্তাল হাওয়ায় পরিণত হন অগ্নিকন্যায়। তিনি তৎকালীন ইংরেজ ক্ষমতার প্রতিভূ বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যার প্রচেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তবে এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নয় বছর কারাদন্ড দিয়েছিল। কিন্তু কারাবরণ শেষেও তাঁর দেশের প্রতি ভালোবাসা বিন্দু মাত্র কম হয়নি বরং বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি অবিরাম ভারতের স্বাধীনতার জন্য একজন আদর্শ দেশপ্রেমিকের মত লড়াই করেছিলেন। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন। বাংলায় যখন নোয়াখালিতে দাঙ্গা হয় তখন গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং দাঙ্গা পীড়িতদের মধ্যে থেকে রিলিফের কাজ করেছিলেন। মরিচঝাঁপিতে যখন মানুষের আর্তনাদ শুনলেন তখনও তিনি তাদের পাশে দাঁড়ালেন। তিনি এমনই দৃঢ়চেতা ছিলেন যে, যখন ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশনের ব্যবস্থা করেন তখন তিনি অনুদান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিকের মতো বলেছিলেন দেশ সেবার জন্য কোনো পেনশন হয়না। আমি এই গবেষণা পত্রের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে তিনি শুধুমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং দেশের প্রতি আত্মত্যাগ, কর্তব্য, দেশপ্রেম এবং মাতৃভূমির মুক্তিকল্পে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শব্দ সূচকঃ দেশপ্রেম, মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ছাত্রীসংঘ, অগ্নিকন্যা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষে স্বাধীনতাকামী নারী যোদ্ধার কোনো অভাব ছিল না। তাদের মধ্যে স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগ্রামের নারী যোদ্ধাদের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন বীণা দাস। পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলার অন্যতম

অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র কৃষ্ণনগর শহরে ১৯১১ সালের ২৪ শে আগষ্ট তাঁর জন্ম হয়। (দাশগুপ্ত, ২০২১, পৃঃ- ১২৫) তবে তাঁর পিতার আদি বাড়ি ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরোয়াতলী গ্রামে। (ভৌমিক, ১৯৬৭, পৃ- ২) ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলার অনেক পরিবার ছিল বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন, বীণা দাসের পরিবার সেরকমই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। যে পরিবারের সকল সদস্যই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর মা সরলা দেবী, বাবা বেণী মাধব দাস, বড়ো বোন কল্যাণী দাস এবং তিনি নিজে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণে তাঁর মেজদাদা কারাবরণ করেন। (দাশগুপ্ত, ১৩৬৭, পৃ- ১১৯) বাংলায় রত্নগর্ভা জননীর অভাব ছিল না, যাঁরা ভারত মায়ের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করতে বীর যোদ্ধাদের গর্ভে ধারণ করেছিলেন। বীণা দাসের মা সরলা দেবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিবেদিত একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুলের পাঠ গ্রহণ শেষ করার পর বীণা দাস ছাত্রীসংঘ-এর একজন সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন, যেখানে তরুণ নারী বিপ্লবীদের বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ও গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এই প্রশিক্ষণার্থীরা বীণা দাসের মা সরলা দেবীর দ্বারা পরিচালিত একটি আশ্রমে থাকতেন, যেখানে পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে অস্ত্র এবং বোমাগুলি লুকিয়ে রাখা হত। এই আশ্রমের সদস্যদের মধ্যে বোমা সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়েছিল যা সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সময় বিশেষ উপযোগী হয়েছিল। বীণা দাসের পিতা বেণীমাধব দাস ছিলেন একজন সুপরিচিত ব্রাহ্ম শিক্ষক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্রাহ্ম ছিল একটি আন্দোলন যার লক্ষ্য ছিল একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে যুক্তির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে হিন্দু ধর্ম চর্চার সংস্কার করা। দেশপ্রেমিক আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধব দাসের কথা তাঁর ছাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস 'ভারত পথিক' গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন বেণীমাধব দাসকে, যিনি কিশোর সুভাষচন্দ্রের মনে একটি স্থায়ী আসন গড়ে নিতে পেরেছিলেন। (বসু, ১৩৫২, পৃ- ৩৭) বীণা দাসের বড় বোন কল্যাণী দাস স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। (দাশগুপ্ত, ১৯৫৪, পৃ- ৫৩)

বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক ছিল যে বীণা দাস তাঁর পরিবার থেকে বিপ্লবী প্রবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি পিতার আদর্শে প্রাভাবিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ছোটোবেলায় একদিন বীণা দাস তাঁর মা-এর সাথে মহিলাদের এক সভাতে গিয়েছিলেন যেখানে গান্ধীজী মহিলাদের কাছে আন্দোলনে অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখেন। তখন ছোট্ট বীণা দাস তাঁর হাতের সোনার বালা খুলে দিয়ে এসেছিলেন। (ভট্টাচার্য্য, ১৯৫১, পৃ-২৮-২৯) ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রথম জীবনের স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ কালে কোনো একটি অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ ভাইসরয়ের স্ত্রীকে তাঁদের স্কুলে অতিথি রূপে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। স্কুলের

ছাত্রীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভাইসরয়ের স্ত্রী স্কুলে প্রবেশ করার সময় তারা ফুলের ঝুড়ি হাতে ধরবে এবং ঝুড়ি থেকে ফুল তাদের পায়ে ছড়িয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবেন। কিন্তু তিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন কেন তাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে যারা আমাদের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে। তিনি ঘটনাটিতে ভীষণ অপমানিত বোধ করেন এবং রিহার্সাল থেকে ফিরে যান কিন্তু পুরো ঘটনাটি নিয়ে তিনি ভীষণ ভাবে বিরক্ত হন। তাঁর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো দুজন মেয়ে তাঁর সাথে যোগ দেন। (ধর, ২০১০, পৃ- ৭-৮) যেহেতু তাঁর মনে ভীষণ ভাবে বিপ্লব চেতনা জাগ্রত ছিল সেই কারণে এই ঘটনাটি তাঁর মনে সবসময়ের জন্য থেকে যায়। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, সম্ভবত তাই তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছিলেন তখনই বিদ্রোহ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে প্রিয় উপন্যাসের উপর একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছিল, বীণা দাস লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবি’। উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কারণ এতে ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করা যায় কিভাবে সে সম্পর্কে লেখা হয়েছিল। এই প্রবন্ধ লেখার জন্য তিনি কোনো নম্বর পাননি, তাঁর দিদিমণি যখন একথা তাঁকে বলেন তখন তিনি বলেছিলেন এ নম্বর আমার দেশপ্রেমের খাতাতে তোলা থাকবে। (ধর, ২০১০, পৃ- ৮)

যখন তিনি বড় হচ্ছিলেন তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা বিষয়ের কথা জানতে পারছেন। যেমন কিভাবে তাঁর স্বদেশ ভূমি ইংরেজরা দখল করল ও ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারালো। সর্বপরি ব্রিটিশ অত্যাচারের অগণিত গল্প তিনি শুনেছিলেন। সেই কারণে বীণা দাস তাঁর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর কলকাতায় তাঁর দিদি কল্যাণী দাসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নারী-নেতৃত্বাধীন আধা-বিপ্লবী দল ‘ছাত্রীসংঘ’ (দাশগুপ্ত, ১৩৬৭, পৃ- ৯০) -এ (কলকাতার মহিলাদের জন্য একটি আধা-বিপ্লবী সংগঠন) যোগদানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীনভাবে তাঁর রাজনৈতিক বোধ গড়ে তোলেন। ছাত্রীসংঘ ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত একটি সংগঠন। এই ছাত্রীসংঘটি নানা ধরণের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিল; যার মাধ্যমে মহিলাদের লাঠি এবং তলোয়ার খেলা থেকে শুরু করে সাইকেল চালানো এবং মোটর চালানো সবকিছু শেখানো হয়েছিল। একজন ছাত্রী হিসাবে, বীণা দাস সেন্ট জন’স ডায়োসেসান গার্লস স্কুলে (St. Jhon’s Diocesan Girls’ School) ভর্তি হন এবং স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করে তিনি বেথুন কলেজে ভর্তি হন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল তাতে তিনি তাঁর প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে ব্রিটিশদের নির্মূল করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন বীণা দাস ১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন এখানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু জি ও সি ছিলেন। (ধর, ২০১০, পৃ-১০) বীণা দাসের একজন কলেজ

সহপাঠী বিপ্লবী সুহাসিনী গাঙ্গুলী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তিনি বাস্তবে কিছু করতে আগ্রহী কিনা? (ধর, ২০১০, পৃ-১১) সুহাসিনী গাঙ্গুলী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন ক্রান্তিকারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। (চ্যাটার্জি, ১৯৮৬, পৃ-৩৪) বীণা দাস প্রশ্নের উত্তরে সম্মতি দিলে সুহাসিনী গাঙ্গুলী বঙ্গীয় বিপ্লবী পার্টির কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এই দলটি এতটাই গোপন ছিল যে এর অনেক সদস্য একে অপরের আসল নাম জানত না। বীণা দাস শুধুমাত্র জানতে পেরেছিলেন যে অনুজা চরণ সেন এবং দীনেশচন্দ্র মজুমদার এই গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। এই কথাটি তিনি তখন জানতে পেরেছিলেন যখন ১৯৩০ সালে ২৫ শে আগস্ট এই দুজনে কলকাতার কুখ্যাত অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। বীণা দাস তাঁর দলের সদস্য রূপে, ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। এই কারণে বেথুন কলেজের যেসব মেয়েরা বিক্ষোভে অংশ গ্রহন করেছিল প্রিন্সিপাল সেই সকল মেয়েদের ক্ষমা চাইতে বলেছিল। আর তা না হলে বোডিং ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু কলেজের মেয়েরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। অবশেষে প্রিন্সিপালকেই হার স্বীকার করতে হয় এবং প্রিন্সিপাল নিজেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যান। (ধর, ২০১০, পৃ- ৯) ভারতবর্ষ যে একদিন স্বাধীন হবে এই বিশ্বাস এবং আশা বীণা দাসের বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা তিনি কলেজের গ্রন্থাগারে থাকা ক্ষমতায়ন এবং মুক্তি তত্ত্বের উপর লেখা বইগুলি দ্বারা গভীর ভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

১৯৩০ -এর সময় পর্বে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মরণ উৎসব চলছিল। এই সময় কালেই বিপ্লবী বীণা দাস উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন ওই সংগ্রাম সাধনায় পুরোপুরি ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে। এই বৈপ্লবিক চিন্তা চেতনার ফল স্বরূপ তৎকালীন বাংলার গভর্নর-কে হত্যার পরিকল্পনা করেন। গভর্নরকে গুলি করে হত্যা করার কথা প্রথম তিনি যুগান্তর দলের বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্তকে বলেছিলেন। (দাশগুপ্ত, ১৯৫৪, পৃ- ৫৩) তৎকালীন বাংলায় যুগান্তর দল সহিংস আন্দোলনের সমর্থক ছিল। (চক্রবর্তী, ১৯৫৩, পৃ- ২০) তিনি প্রথম দিকে ভেবেছিলেন যে হয় ডিগ্রী নেবার সময় কনভোকেশন -হলে কিংবা কলকাতার রেস কোর্সে গভর্নরকে গুলি করে হত্যা করবেন তা মনস্থির করেছিলেন। এই পরিকল্পনার দ্বারা চালিত হয়ে ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, বীণা দাস তাঁর স্কার্টের নীচে লুকানো পাঁচটি বুলেট বোঝাই একটি রিভলভার নিয়ে 'পবিত্র আলমা মাতার' ('sacred alma mater') সমাবর্তন হল-এ প্রবেশ করেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর স্নাতক উত্তীর্ণ ডিগ্রী পাওয়ার কথা ছিল। তিনি যে রিভলভার নিয়ে সমাবর্তন হল-এ প্রবেশ করেন তিনি তা যুগান্তর দলের একজন পরিচিত বিপ্লবী কমলা দাসগুপ্ত -এর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। একই সাথে তিনি নিজের জন্য পটাশিয়াম সায়নাইড নিয়ে ছিলেন। (দাশগুপ্ত, ১৯৫৪, পৃ- ৬০-৬১) সমাবর্তন অনুষ্ঠান -এর আগে কখনও বীণা দাস

বন্দুক চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন। বীণা দাস ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মনোভাবের কারণে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানোর প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তবে তাঁর এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন কোনো একটি অজুহাত দেখিয়ে, বীণা দাস মঞ্চের কাছে এসেছিলেন যেখানে বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন তখন তাঁর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্রথমে বীণা দাস স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে দুটি গুলি করেছিলেন। তবে খুব নিকট থেকে গুলি করলেও প্রশিক্ষণ না নেওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি লক্ষ্যচুত্য হন। কোনো ক্রমে স্ট্যানলি জ্যাকসন রিভালভারের গুলি এড়াতে সক্ষম হলে, উপাচার্য হাসান সোহরাওয়ার্দী বীণা দাসের উপর ঝাঁপিয়ে পরেন এবং তাঁকে পরাভূত করেন। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর বন্দুকে গুলি ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি গুলি চালাতে থাকেন অর্থাৎ অপ্রতিরোধ্য অবস্থাতেও অবশিষ্ঠ তিনটি গুলি তিনি স্ট্যানলি জ্যাকসন কে লক্ষ্য করে চালিয়েছিলেন। তবে শুধুমাত্র স্ট্যানলি জ্যাকসনের কানে একটি বুলেটের ঘষা লেগেছিল, তাছাড়া তিনি পুরোপুরি অক্ষত ছিল। (নিউজ পেপার, ১৯৩২) এই ঘটনার পর বীণা দাস -এর নাম নানা খবরের কাগজের শিরোনামে এসেছিল। তবে মজার বিষয় হল, যখন তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের গল্পটি বিদেশে পৌঁছায় এবং ঘটনাটি ও তাঁর নাম অসংখ্য সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল তখন তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন -এর উপর গুলি চালানোর অপরাধে বিচারে তাঁর কারাবাস হয় এবং তিনি ফেডারেল কারাগারে নয় বছরের সাজা ভোগ করার জন্য গিয়েছিলেন। কমলা দাশগুপ্ত এই দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য নানা বিপদ এবং শাস্তির বিষয়ে তাঁকে জানান; যেমন জেলে অমানুষিক অত্যাচার, কালাপানির সাজা, এমনকি ফাঁসির ভয়ও দেখানো হয় কিন্তু বীণা দাস তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। (দাশগুপ্ত, ১৯৫৪, পৃ- ৫৭-৫৮) ১লা মার্চ গভর্নর স্ট্যালিন জ্যাকসনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার সন্দেহে কমলা দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে ও পরে হিজলি জেলে রাজবন্দী করে রাখা হয়েছিল। (দাশ, ২০১৪, পৃ- ২৪২)

তাঁর গ্রেফতারের পর বহুবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে কে বা কারা জড়িত ছিলেন, তবে তিনি কিন্তু তাঁর সহযোগী অন্য বিপ্লবীদের নাম প্রকাশ করেননি বরং তিনি অন্য বিপ্লবীদের কে এবিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং তিনি তাঁর কাজকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি নির্ভীকচিত্তে স্বীকার করেছেন — "আমি স্বীকার করছি যে আমি সিনেট হাউসে শেষ সমাবর্তনের দিনে গভর্নরের উপর গুলি চালিয়েছিলাম। এর জন্য আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল মরে যাওয়া এবং যদি আমাকে মরতে হয়, আমি এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে মহৎভাবে তা করতে চেয়েছিলাম... আমি আমার দেশের প্রতি ভালবাসায় প্ররোচিত হয়ে গভর্নরকে গুলি করেছিলাম যা ব্যর্থ হয়েছে"। (নিউজ পেপার, ১৯৩২) তাঁর বিবৃতিতে, বীণা দাস একজন ব্যক্তি

হিসাবে স্ট্যানলি জ্যাকসন এবং একজন গভর্নর হিসাবে স্ট্যানলি জ্যাকসনের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় পার্থক্য করেছেন। তাঁর ক্ষোভ কখনোই ব্যক্তিগত ছিল না, এবং তিনি দৃঢ়তার সাথে দাবি করেছিলেন যে তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলার গভর্নর পদাধিকারী যে কোনও ব্যক্তির উপর গুলি চালাতেন। তাঁর এই কাজটি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক, যারা ৩০ কোটি ভারতবাসীকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। (নিউজ পেপার, ১৯৩২) যাই হোক ১৫ ফেব্রুয়ারি একতরফা বিচারে বীণা দাসের ৯ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত।

বীণা দাসকে প্রথম কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়, কিছুদিন পর সেখান থেকে মেদিনীপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখানে বিপ্লবী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী আগে থেকেই বন্দী ছিলেন। মেদিনীপুর জেলে কিছুদিন তাঁদের আনন্দেই কেটেছিল। কিন্তু জেলখানা আনন্দের জায়গা নয়। ঐ জেলের যে জেলার ছিল তার অনাচারের প্রতিবাদে এঁরা তিনজন অনশন আরম্ভ করেন। উপবাসের সপ্তম দিনে কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে নিলেন। জেলের ভিতরেও তাদের বিপ্লবী মনসিকতা দেখে ব্রিটিশ প্রশাসন নিজেদের ভুল শুধরে নেয় এবং ইংরেজরা বীণা দাস ও শান্তি ঘোষকে হিজলী জেলে নিয়ে গিয়েছিল রাজবন্দীনীরা যেখানে আগে থেকেই বন্দী ছিলেন। (দাশগুপ্ত, ২০২১, পৃঃ- ১২৭) বীণা দাস যেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্গত বাংলার শক্তিধর গভর্নরের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিস্মৃত হয়েছিল কিভাবে একটি ২১ বছর বয়সী যুবতী মেয়ে এত দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে?

বীণা দাস তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত হয়ে বন্দী ছিলেন। গান্ধীজির প্রচেষ্টায় সকল রাজনৈতিক বন্দী এবং বিনাবিচারে বন্দী হওয়া বিপ্লবীরা মুক্তি পেয়েছিলেন। এই সময় বীণা দাসও মুক্তি পান। তবে তিনি ব্রিটিশ আইনে ৯ বছর কারাবাসের দন্ডে দন্ডিত হলেও পুরো সাত বছর জেলে সাজা ভোগ করে ১৯৩৯ সালে মুক্তি পান। (দাশগুপ্ত, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ , পৃ- ১২২) এমনকি মুক্তির পরেও তিনি তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনের সংকল্প হারাননি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বীণা দাস যেমন বিপ্লবী ছিলেন তেমনি অসাধারণ লেখিকা ছিলেন; তিনি কমলা দাশগুপ্ত সম্পাদিত ‘মন্দিরা’ পত্রিকাতে তাঁর লেখা কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। (দাশগুপ্ত, ১৩৬৭, পৃ- ১২৩)

১৯৩৯ সালে বীণা দাস দন্ডিত সময়ের পূর্বে তাড়াতাড়ি মুক্তির পর, তিনি কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন শুরু হলে তিনি এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এসময় তিনি দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকা ছিলেন। কোনো প্রশাসনিক অনুমতি না

নিয়েই কলকাতার হাজরা পার্কে তিনি দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সভা ডাকলেন। তাই বে-আইনী এই সভাতে উপস্থিত এক সহকর্মীকে ব্যাটন দিয়ে প্রহাররত ব্রিটিশ পুলিশ সার্জেন্টের হাত শক্ত করে চেপে ধরতেই পুলিশ বীণা দাসকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই বীরাঙ্গনা ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আবার প্রেসিডেন্সি জেলে কারাবরণ করেন। (দাশগুপ্ত, ২০২১, পৃঃ-১২৮) কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বাইরে আসেন তখনও তাঁর বিদ্রোহী ভাবনাকে তিনি বিসর্জন দেননি। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত তাঁর বৈপ্লবিক সক্রিয়তা অব্যাহত রাখেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য হন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন।

বীণা দাস 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কর্মচারীদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বহুদিন ধরেই এই ইউনিয়নের কর্মীদের মধ্যে অভিযোগ ও বিক্ষোভ জমা হয়েছিল। তিনি ইউনিয়নের কর্মীদের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য এক দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন। এই সময় তাঁর প্রধান দুই সহকর্মী ও সহায়ক তথা সহযোদ্ধা ছিলেন তারাদাস ভট্টাচার্য এবং বীরেশ্বর ঘোষ। বীণা দাস আরো অনেকগুলি ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করেছিলেন। (দাশগুপ্ত, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১২৪) বাংলায় যখন নোয়াখালিতে দাঙ্গা হয় তখন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং দাঙ্গা পীড়িতদের মধ্যে থেকে রিলিফের কাজ করেছিলেন। এই সময় গান্ধীজী নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানকার প্রত্যেকটি গ্রামে গিয়ে পীড়িতদের সাহায্যের জন্য দু-একজন সমাজকর্মী মিলে এক-একটি কেন্দ্র করে বসবেন। এই কর্মীদের পালনীয় কর্তব্য ছিল গ্রামের ভয় কাতর লোকদের সাহস সঞ্চার করা, পুনর্বসতি স্থাপন করা, সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব যাতে ফিরে আসে সেদিকে নজর রাখা প্রভৃতি কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখা। বীণা দাসের উপর দায়িত্ব পড়েছিল রামগঞ্জ থানার নোয়াখোলা গ্রামে একটি কেন্দ্র করে বসে পরিস্থির সামাল দেওয়া। (দাশগুপ্ত, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১২৪) স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও তিনি সাধারণ অসহায় ও সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়িছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপিতে গিয়ে শরণার্থীদের উপর পুলিশের অত্যাচারের তীব্র বিরোধীতা করেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দৃঢ় ও নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। (ধর, ২০১০, মুখবন্ধ)

জীবনের শেষ পর্বে বিপ্লবী বীণা দাসের স্মৃতি একেবারেই সুমধুর ছিল না। তাঁর স্বামী যুগান্তর দলের সদস্য যতীন ভৌমিকের মৃত্যু, উত্তর স্বাধীনতা যুগের সার্বিক হতাশা তাঁর মনকে এত আঘাত করে যে তিনি বাংলাতে থাকতে পারেনি, যার জন্য হৃষিকেশে চলে গিয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতের সরকার বিষয়টিকে নজর দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ মনেই করেননি। ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর হরিদ্বারে গঙ্গার

ঘাটে এক অজ্ঞাত পরিচয় বয়স্কা মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। সংবাদপত্রে খবরটি বের হয়েছিল। অবশ্য পরে, পুলিশের করা কেস ডায়েরি থেকে জানা যায় নির্বন্ধক জীবন সায়াহ্নের পর নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া সেই মৃতদেহের নাম বীণা দাস। (দাশগুপ্ত, ২০২১, পৃঃ- ১৩০) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইংরেজদের উদ্বেগ এই অগ্নিকন্যার প্রস্থান হল একেবারে অজ্ঞাতে-নিভৃতে। বীণা দাস ১৯৬০ সালে, তাঁর সামাজিক কাজে অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছিলেন। (পদ্ম পুরষ্কার ডিরেক্টরি ১৯৫৪-২০১৪) বীণা দাসের মৃত্যুর পর ২০১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৯৩১ সালে উত্তীর্ণ ব্যাচের জন্য সম্মান সহ মরণোত্তর স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করে। (নিউজ পেপার, ২০১৭) প্রতিটি বিদ্রোহী তাঁর নিজের সঙ্গে যুদ্ধের মুখোমুখি হয়, তবে এটির সবচেয়ে ভাল জিনিসটি হল বিপ্লব কখনই বৃথা যায় না। বীণা দাসের জীবন এমনই ছিল যে তাঁর ভিতরের আগুন কখনই শীতল হয়নি বরং বেড়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেছে যতক্ষণ না তিনি স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি এমনই দৃঢ়চেতা ছিলেন যে, যখন ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশনের ব্যবস্থা করেন তখন তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। দেশপ্রেম যেন তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল। তিনি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিকের মতো বলেছিলেন দেশ সেবার জন্য কোনো পেনশন হয় না। এমনি ছিল তাঁর নিখাদ দেশপ্রেম, যার জুড়ি মেলা সত্যি খুবই কঠিন।

তথ্যসূচি

দাশগুপ্ত, কমলা, (২০২১), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

ভৌমিক, বীণা, (১৯৬৭), *পিতৃধন*, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, কলকাতা

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৩৬৭), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, বসুধারা প্রকাশন, কলকাতা

বসু, সুভাষচন্দ্র, (১৩৫২), ভারত পথিক, প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী কল্যাণী, (১৯৫১), *জীবন অধ্যয়ন*, প্রকাশক শ্রী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৯৫৪), *রক্তের অক্ষরে*, নাভানা, কলকাতা

ধর, ধীরা, (২০১০), *বীণা দাস: অ্যা মেমোইয়ার*, জুবান, নিউ দিল্লী

ধর, ধীরা, (২০১০), *বীণা দাস: অ্যা মেমোইয়ার*, জুবান, নিউ দিল্লী

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৩৬৭), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, বসুধারা প্রকাশন, কলকাতা

ধর, ধীরা, (২০১০), *বীণা দাস: অ্যা মেমোইয়ার*, জুবান, নিউ দিল্লী

ধর, ধীরা, (২০১০), *বীণা দাস: অ্যা মেমোইয়ার*, জুবান, নিউ দিল্লী

চ্যাটার্জি, ইন্দ্রাণী, (১৯৮৬), *দি বেঙ্গলী ভদ্রমহিলা- ফমস অফ অর্গানাইজেশন ইন দি আর্লি টুয়েনটিথ চেঞ্চুরি*, মানুশি

ধর, ধীরা, (২০১০), *বীণা দাস: অ্যা মেমোইয়ার*, জুবান, নিউ দিল্লী

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৯৫৪), *রক্তের অক্ষরে*, নাভানা, কলকাতা

চক্রবর্তী, শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ, (১৯৫৩), *জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা কমিটি, কলকাতা

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৯৩২), *রক্তের অক্ষরে*, নাভানা, কলকাতা

গ্লাসগো হেরাল্ড, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৯৫৪), *রক্তের অক্ষরে*, নাভানা, কলকাতা

দাশ, অসিতাভ (২০১৪), *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত তারিখ অভিধান* (১৭৫৬-১৯৪৭), পত্রলেখা, কলকাতা

দি রিডিং ঈগল, সোমবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

দি রিডিং ঈগল, সোমবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

দাশগুপ্ত, কমলা, (২০২১), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৩৬৭), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, বসুধারা প্রকাশন, কলকাতা

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৩৬৭), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, বসুধারা প্রকাশন, কলকাতা

দাশগুপ্ত, কমলা, (২০২১), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৩৬৭), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, বসুধারা প্রকাশন, কলকাতা

দাশগুপ্ত, কমলা, (১৩৬৭), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, বসুধারা প্রকাশন, কলকাতা

ধর, ধীরা, (২০১০), *বীণা দাস: অ্যা মেমোইয়ার*, জুবান, নিউ দিল্লী

দাশগুপ্ত, কমলা, (২০২১), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

পদ্ম পুরষ্কার ডিরেক্টরি (১৯৫৪-২০১৪), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ভারত) মে ২১

দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, সংগৃহীত ২১ ডিসেম্বর